সুরঞ্জন প্রামাণিক

সাহিত্য: সংকট ও উত্তরণের ভাবনা-সূত্র

আমরা একটা 'সংকট' বুঝতে পারছি কিংবা সেটা সংকট না-ও হতে পারে— স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। তা-ও কি বলা যাবে? সংশয় আছে। যেমন ধরা যাক, এই মুহূর্তে স্মরণে এল, আমাদের শহরে একজন কবি আত্মহত্যা করেছেন, কবিবন্ধুদের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করা হয়েছে, সেই ঘটনার আগে বা পরে এই শহরেই একজন কলেজছাত্র খুন হন, খুনিদের শাস্তি চেয়ে তাঁর ছবিযুক্ত পোস্টার সাঁটা হয়েছে সমস্ত শহর জুড়ে... মনে পড়ছে— 'প্রেমিক' ও তার বন্ধুরা মিলে 'প্রেমিকা' কে ধর্ষণ করেছে— এরকম খবর, কোথাও যেন ঘটেছিল; এই তো একটার পর একটা ঘটনা মনে পড়ছে... বারাসাত, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম... মোমবাতি মিছিল— আরো সব, ঠিক মনে পড়ছে না— সুজেৎ জর্ডন— পার্কস্ট্রিট... এগুলো বোধহয় ঠিক সংকট নয়, এরকম তো ঘটেই থাকে— চারদিকে বিশ্বাসের মৃত্যু...

কিন্তু এই-সব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়েই তো কেউ কেউ বলে ফেলেন বা লেখেন 'বর্বরোচিত' ঘটনা— তাহলে কি— এই-সব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের মনে-হওয়া 'সংকট'কে সভ্যতার সংকট বলা যাবে?

কথাটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের ওই সংকটবোধ অনেকটাই তাঁর বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্রিটন সভ্যতাকে তিনি 'চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত' বলে জেনেছিলেন। তার বিকৃতি ইংরেজদের ভারত শাসনে প্রকাশ পাচ্ছিল: 'অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-শিক্ষা-আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর-মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি।' রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গিতে এরকমটা ঘটা উচিত ছিল না বলেই একে 'সভ্যতার সংকট' নামে অভিধায়িত করেছিলেন— আমাদের কি তেমন কোনো বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা আছে?

কিন্তু ওই প্রবন্ধেই তিনি কিন্তু এরকম লিখেছেন যে, 'মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।'— আজও সেই ট্র্যাডিশন কি সমানে চলছে না? মানবাধিকারের প্রশ্নে তো তেমনই মনে হয়!

আরো একটা ব্যাপার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েছিল। তাঁর ভাষায় 'ভারতবাসীর অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ'— স্বাধীনোত্তর ভারতে 'হিন্দু-মুসলমান' সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার 'শ্রী' বৃদ্ধি ঘটেছে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অতএব, আমাদের উপলব্ধ সংকটকে 'সভ্যতার সংকট' আখ্যা দিলে অসংগত হবে না।

তবু আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরিত্রাণের যে-আশা মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তা আজও পূর্ণ হয় নি— প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাস হারানোর পাপের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

তাহলে 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করা' যে 'অপরাধ', তা-ই কি করব আমরা? নাকি রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো পরিত্রাণকর্তার আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকব?

তিনি যখন এই আশা পোষণ করছেন তখন চীন দেশে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে জাপবিরোধী লং-মার্চ চলছে— মাও-সে-তুং-কে তিনি 'পরিত্রাণকর্তা' ভেবেছিলেন কি-না বলা মুশকিল।

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য কিন্তু তেমনই ইঙ্গিত রেখেছে।

যদি তা-ই হয়— মনুষ্যত্বের পরাভবই কিন্তু সত্য হয়ে আছে। তা চীন দেশেও যেমন সত্য, ভারতভূমিতে তেমনই সত্য।

তাহলে— পরিত্রাণকর্তার ধারণা একটি ইল্যুশন মাত্র! তবু, ওই অপরাধ করব না বলেই হয়তো এই আলোচনা—

২

এই যে 'আমরা' কথা বলছি— একটু পরিষ্কার হয়ে নেওয়া ভালো— এই আমরা কারা!

কোনো ভনিতা না করেই বলা যায় আমরা যারা সাহিত্যচর্চা করি, বিশেষ করে চর্চার ক্ষেত্র যাদের লিটল ম্যাগাজিন, এই আমরা তারা।

তার মানে এই আমরা 'বিশেষ'— বাংলা ভাষায় কম-বেশি দু'হাজারের মতো লিটল ম্যাগের অনিয়মিত প্রকাশ লক্ষ করা গেছে— এই দু'হাজারে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন তাঁদের সকলেই যে এই 'বিশেষ আমরা' ভুক্ত— এমন দাবি করা বোধহয় সংগত হবে না।

আর-একটু স্পষ্ট করা যাক— যাঁরা সংকট উপলব্ধি করছেন ও সংকট মুক্তির পথ খুঁজছেন, পথে নামছেন এমন কি যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন— এই-সব তাঁরা মিলে 'আমরা'।

'প্রশ্ন তোলা'-র ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করা দরকার।

প্রতি বছর ছোটো-বড়ো নানা সাহিত্য-পুরস্কারে ভূষিত হন বহু সাহিত্যিক— 'সাহিত্য'-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোনো-কোনো সাহিত্য-অনুরাগী সবিস্ময়ে জানতে চান: চারিদিকে তবু এত অকল্যাণ কেন?

যারা এই আলোচনা করছি, কেউ কেউ প্রশ্নটা নিজের কাছেই রেখেছি। একই সঙ্গে নিজের সাহিত্য-কর্মের প্রতি একধরনের সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নিজের অবস্থান সম্পর্কেও দেখা দিয়েছে সংশয়।

আর আমাদের সংশয়ী মন প্রশ্ন তুলেছে: গোয়টে-শিলারহাইনে-রিলকে-কান্ট-হেগেল— এঁদের হাত ধরে যে-জাতির সাহিত্য-দর্শনের অসাধারণ উৎকর্ষ, সেই জাতির মানুষ কিভাবে মানুষের চামড়া দিয়ে বাইবেল বাঁধানোর মতো অপকর্ম করতে পারে? কিভাবে মানুষের

চর্বি মেশানো সাবান দিয়ে স্নান সারতে পারে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা বিপন্ন বোধ করি: তাহলে সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত যে-অর্থ আমরা লালন করি, যে-তাৎপর্য আমরা পোষণ করি, তার মধ্যে কি কোনো ফাঁক আছে? কিংবা আর কিছু—

৩

ব্যাপারটা বোধহয় এরকমও ভাবা যায়: জাতি-ধারণার মধ্যেই একটা বিশৃঙ্খলা আছে, বিশেষ করে দেশ-ধারণার সঙ্গে জাতি যেখানে জড়িয়ে থাকে— এই বিশৃঙ্খলা আসলে কিন্তু মননগত, বেঁচে থাকার প্রশ্নে, বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নে তা সমাজ-মনস্তত্ত্বের বিষয়— যাকে বলে 'জীবন সংগ্রাম'— সারভাইভ করার প্রশ্নে এই-যে 'বিশৃঙ্খলা'— সাহিত্য তাকে সংগতিপূর্ণ বিন্যাসের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়— আসলে চাওয়াটা তো শেষ বিচারে সাহিত্যিকের।

তাহলে, এই কথা কি বলা যাবে যে, আমরা যাকে 'সংকট' ভাবছি আসলে তা ওই জাতিগত 'বিশৃঙ্খলা'র মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া?

তা যদি বলি, বলতেই হবে— সেক্ষেত্রে এই 'সংকট' আর-কারো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেন— এই প্রশ্ন উঠবে।

এবং আমরা বলব, বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে-থাকতে অথবা 'জীবন-সংগ্রাম'-এর তত্ত্ব মেনে নিয়ে, এ-ধরনের ঘটনার 'অনিবার্যতা আছে'-জ্ঞানে, অধিকাংশ মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারেন না।

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি সাহিত্যকারকে 'মহত্ত্ব' দান করছি না?

এরকম যদি মনে হয়, তাহলে 'এটা উপলব্ধি করতে পারেন না'-র পরে আরো একটা বাক্য ব্যবহার করা যাক: এটাই সভ্যতার অন্যতম চরিত্রলক্ষণ।

আরো সংযোজন: বিশেষ করে আধুনিক বণিক-সভ্যতায় এই বিশৃঙ্খলা যত তীব্র হয়েছে, ততই তা অনুভব করার পরিসর তথা অবকাশ মানুষ হারিয়েছে।

'সভ্যতা' যে গৌরবার্থ বহন করে তা কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়ল! রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্রে সমাবেশ'।

ঠিক। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য কী, না, একসঙ্গে বাঁচা ও বাঁচিয়ে রাখা। এই-যে সমবেত প্রয়াস তথা কৃত্য— এ হলো সংস্কৃতি, সভ্যতার জননী।— এ-ও সত্য। এ-পর্যন্ত ভাবতে কোনো অসুবিধে নেই। এ নকি, সংস্কৃতির পরিশ্রুত প্রকাশ শিল্প-সাহিত্য— এ-ভাবনাতেও কোনো বিরোধ নেই। কি আমরা যদি প্রশ্ন করি: একসঙ্গে বাঁচা ও বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কী? —এর উত্তর সহজ নয়। জটিল। প্রশ্নটা যদি এমন হতো: সভ্যতার উদ্দেশ্য কী?

এর উত্তর আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব! প্রথমেই বলা হবে 'সভ্যতা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'সিভিলাইজেশন'। শব্দটি তৈরি হয়েছে ক্রিয়াবাচক শব্দ 'সিভিলাইজ' থেকে, যার অর্থ বর্বর-জীবন থেকে উন্নত করা, সভ্য করা ইত্যাদি।

অতএব, সভ্যতার উদ্দেশ্য 'বর্বরতা' থেকে সমাজকে মুক্ত করা। অতএব, তার মধ্যের যুদ্ধ-প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানাতে হবে।

তাহলে সমবেতভাবে বাঁচা ও বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য এবার খানিকটা আন্দাজ করা সম্ভব— আরো স্পষ্ট হবে, আমরা যদি স্মরণ করি 'দাসযুগ'-এর সূচনায় কেন যুদ্ধবন্দিদের বাঁচিয়ে রাখার প্রচলন ঘটেছিল।

তবু আমাদেরই কেউ বলবেন, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তো সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে!

অতএব, 'হে যুদ্ধ স্বাগত'— লু-সুনকে কোট করলাম। যুদ্ধের নিরিখে মনুষ্যত্বের প্রশ্নে 'সভ্যতা'র তাহলে গৌরব করার মতো কিছু নেই। এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে, সভ্যতার সামাজিক ধাঁচ 'পিরামিড'-এর মতো, ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস যার বৈশিষ্ট্য— অনেকে বলেন সমাজ বিবর্তনের ধারায়, এ-সব এক অনিবার্য পরিণতি, যেন-বা 'নিয়তি' নিয়ন্ত্রিত।

এক অর্থে ব্যাপারটা কিন্তু 'অনিবার্যতা'র তত্ত্বের মধ্যেই আছে। কেননা, এ-তত্ত্ব প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মানুষের প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বকামিতা-প্রসূত যে-'রাজনীতি', তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আবারও একটা পুরোনো উদাহরণ দেয়া যাক: এথেন্স নগররাষ্ট্রে কোনো-এক সময় শাসক ও শাসক-সহায়ক শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের যে অনুপাত ছিল ৩ : ১৭, আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতায় সেই অনুপাত একই দেখা গেছে 'মণ্ডল কমিশন'-এর রিপোর্ট-এ। সার্বিক এই প্রেক্ষাপটে আমরা 'সংকট'কে বোঝার চেষ্টা করলাম মাত্র। কারো নিন্দা করা কিংবা গৌরবহানি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পাশাপাশি এ-কথাও উল্লেখ থাক— শেষ বিচারে সবই জীবিকার সংকট।

৪

প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয় ও প্রকৃতির অধিকার হারানো মানুষের উপর মানুষেরই প্রভুত্ব কায়েম— এই ঘটনা দুটি বলা বাহুল্য সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু কোনো বিজয়ই চূড়ান্ত নয়, বিজয়ের পরমুহূর্ত থেকেই প্রতিক্রিয়ার ভয়, হারানোর ভয় বিজেতা মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। একইভাবে, অধিকার হারানো মানুষ, পরাধীন মানুষ তার অধিকার ফিরে পেতে চাইবেন, স্ব-অধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগবে তাঁর— এও সত্য। আর এই দু'তরফের মনোভাব-মনোভঙ্গি যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরা শিল্পী— কেউ পক্ষ-অবলম্বন করেছেন, কেউ-বা বীতশোক বীতস্পৃহ হয়ে তা করেছেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে উদাহরণ ঋক্‌বেদ-এর ঋষিগণ। দ্বিতীয় উদাহরণ উপনিষদের ঋষি— এ-বিষয়ে একটি উদ্‌ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে, হরফ প্রকাশনীর উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)-এর ভূমিকাতে শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন, 'সাংসারিক জীবনের ধন, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহ এবং সম্পূর্ণ উদাসীন এক শ্রেণির লোকই জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণের উৎসুক হইয়া সংসার ত্যাগপূর্বক এ-বিষয়ে অরণ্যে বসিয়া গভীর ধ্যান-ধারণা করিতেন, তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পাইয়াছে।'

ধন-মান-প্রতিপত্তি যে সংসার-জীবনে বিশৃঙ্খলার কারণ, অর্থই অনর্থের মূল— এ-সব

তত্ত্ব উপনিষদের বিভিন্ন ঋষি বিশৃঙ্খলার বাইরে বেরিয়ে বা তথাকথিত সভ্যতা থেকে বিযুক্ত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন— এরকম অনুমান আমরা করতে পারি। উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংসারের বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।

অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে যে প্রয়োগ-প্রস্তাবনা থাকে, সমাজ-সংসারে তা হয় সর্বত্র পৌঁছায় না, আর যদিও-বা পৌঁছায়, তার মূল্য রিপু-তাড়িত মানুষ দিতে চায় বলে মনে হয় না— অবস্থাটা উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একই রয়েছে।

শ্রুতির যুগে কিন্তু অবস্থা অনেক ভালো ছিল। কথক ও শ্রোতা— শ্রোতৃমণ্ডলী, আধুনিক ভাষায় যাকে 'ইন্টার‍্যাকশন' বলে তা ঘটার সুযোগ ছিল। সাহিত্যপাঠ এখন একান্ত ব্যক্তিগত। আর ব্যক্তিগত বলেই সাহিত্য ক্রমে তার সাহিত্যগুণ হারিয়ে কেবল বিনোদনের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পণ্যচরিত্র অর্জন করেছে। আমরা সকলেই জানি পণ্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য উপভোক্তাকে তৃপ্ত করা। পণ্য— চাহিদানির্ভর। এবং সমস্ত চাহিদাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং তা বাজারনির্ভর। চাহিদা-যোগানের তত্ত্ব মেনে তার 'উৎপাদন' ঘটে। এই দিক থেকে সাহিত্য কেবল নন্দনতত্ত্বের বিষয় নয়, অর্থনীতিরও বিষয়।

এর অর্থ— যাকে আমরা সভ্যতার সংকট বলছি একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে তা-ই 'গ্রেট ডিপ্রেশন'।

প্রসঙ্গত দু'হাজার আট সালে যে 'গ্রেট ডিপ্রেশন' পৃথিবীব্যাপী দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব, ডিপ্রেশনের পূর্বাপর অবস্থা স্মরণে রাখলে দেখা যাবে, এখনও তা অব্যাহত— সমস্ত গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে উৎক্রমণের জন্য রাজনীতিকরা সামরিক উপায় অবলম্বন করেছেন, এখনও তা করে চলেছেন। আমাদের দেশে ছোটো ছোটো এলাকা দখলের লড়াই কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ, কিংবা সাম্প্রতিক 'সন্ত্রাসবাদ'— যার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধঘোষণা— এ-সবই চলমান 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'— সভ্যতার সংকট ডেকে এনেছে।

একে কি আমরা সভ্যতার অবসাদগ্রস্ত দশা বলতে পারি?

এটা বললে বরং আমাদের সুবিধা হয়। অবসাদ একটি মানসিক রোগ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অবসাদ থেকে মানুষ হত্যা-আত্মহত্যা দু-ই করতে পারে।

অর্থাৎ এটা রোগগ্রস্ত মানুষের 'আত্মনাশ'। মানবিক গুণগুলির অবক্ষয় থেকে এ-ধরনের বিকার ঘটে—এ-ও আমরা জানি যে, যুদ্ধের পরিবেশে এ-ধরনের অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি ঘটে।

এ-বিষয়ে বোধহয় আমরা তথ্যের ব্যবহার করতে পারি। তার আগে এটুকু ভূমিকা দরকার যে, সভ্যতার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিশু-কিশোর/কিশোরী— এটা আমাদের বিশ্বাস— আমাদের এই বিশ্বাস আজ বিপন্ন— 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৩ সালে শিশুদের প্রতি অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২.৫%, ২০১২-র তুলনায়। আর শিশুদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বৃদ্ধি ঘটেছে ১৬.১%, বিশেষভাবে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০.৩%। এটাও ওই ২০১২-র তুলনায়।

পাশাপাশি একটা খবর আমরা উল্লেখ করব: ৮-৪-২০১৫ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৫—প্রতিবেদক লিখছেন, 'নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০০২ সালে নাবালকদের হাতে খুনের সংখ্যা ছিল ৫৩১টি। ২০১৩-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০৭টি। একই সময়কালে নাবালকদের হাতে ধর্ষণের ঘটনা ৪৮৫ থেকে ১৮৮৪-তে গিয়ে পৌঁছেছে।'

আর-একটু তথ্য সংযোজন করতে হবে: এন সি আর বি তাঁদের রিপোর্টে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, এই অপরাধী নাবালকদের ৫২% গরিব পরিবারের সন্তান ও ৮১% বাবা-মার সঙ্গেই থাকে। এদের মধ্যে ৩৭% নিরক্ষর, প্রাথমিক শিক্ষাটুকু পেয়েছে মাত্র ৬৩%।

এর সঙ্গে কিন্তু বিনোদন-সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই! তা নেই, কিন্তু সিনেমা-সিরিয়ালের সম্বন্ধ রয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে। আমরা ওই তথ্য তুলে ধরে কেবল 'সভ্যতার সংকট'-এর অবয়বটা দেখলাম মাত্র।

যে-ছবিটা আমরা দেখলাম, যে-চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে তা কিন্তু আমাদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছে এই আলোচনায় প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের যে-কথা আমরা তুলে ধরেছি, সে-সব; সেখানে 'মনুষ্যত্বের... পরাভব' আর 'মানবপীড়ন'— খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে— সাম্প্রতিক সময়ে মনুষ্যত্বেরই অবক্ষয় যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে আর মানবপীড়নকে মনুষ্যত্বহীন এই বেঁচে থাকায় এক অন্যতম বিনোদনকর্ম ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

কিন্তু এরপরেও আমাদের বলতে হবে: এরা সব প্রকৃতির অধিকার হারানো মানুষের উত্তরপুরুষ, সাম্প্রতিকে 'বেঁচে থাকার অধিকার' হারানো মানুষ!

এবং একইসঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে: এ-সবই ঘটছে রাষ্ট্রীয় পরিসরে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে। যেখানে জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খাদ্যের অধিকার— এক-একটি আইনি অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কেবল বললেই হবে না, আমাদের বোধহয় প্রশ্ন তোলার সময় হয়েছে: তবু কেন এ-সব ঘটছে?

খুব সহজ-সরল উত্তর: অধিকার দাবি করা ও অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার যে-শিক্ষা, তার অভাব রয়েছে উভয় পক্ষেই। একপক্ষ অধিকারকে অনুগ্রহ বলে মানতে শিখেছে অন্যপক্ষ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কলাকৌশল আরো উন্নত করেছে।

আমাদের সভ্যতার অবসাদের গভীরতা বুঝতে আরো একটি খবর উল্লেখ করা যাক। ২০১২ সালের জুলাই মাসে, দিনক্ষণ ঠিক মনে নেই, খবরের শিরোনামটা মনে আছে— 'আত্মহত্যায় এগিয়ে ভারতীয় যুব সমাজ, বলছে সমীক্ষা'— খবরের বিশেষত্ব ছিল এই যে, গরিব-নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিতদের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই নিজেকে খুন করবার প্রবণতা বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক: আমাদের দেশে প্রতি ৪ মিনিটে ১ জন আত্মহত্যা করেন। ঘণ্টায়

আমাদের বুকে বোধহয় দীর্ঘশ্বাস জমছে। অন্তত কারো-কারো বুকে। আবার কেউ বলবেন এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। সেই সারভাইভ করার প্রশ্ন— অযোগ্য জনেরা আত্মহত্যা করেন। কেউ বলতে পারেন, আত্মহত্যা শেষ বিশ্লেষণে খুন— 'কেউ' খুন করে তাকে। যাই হোক, সভ্যতাকে কি অবসাদ মুক্ত করবার কোনো উপায় আছে?

এই প্রশ্নটা আমরা রেখেছিলাম দু'-একজন মানবাধিকার কর্মীর কাছে। তাঁদের মতে মানবাধিকার সনদের প্রস্তাবনা ও সংবিধানের প্রস্তাবনাকে কার্যকর করবার নৈতিক দায় বহন করতে পারলে অবসাদমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি-না। আমরা ইতস্তত করছিলাম। তিনি জানালেন, "তলস্তয়ের মনে হয়েছিল, রাষ্ট্র হলো সেই ষড়যন্ত্রী যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শোষণ করা এবং মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলা— এরকম কিছু কি আপনাদের মনে হয়?"

আমাদের কারো মধ্যে সংশয় জেগেছে— তলস্তয় কি মার্কস্‌বাদী ছিলেন? সে-সংশয় প্রকাশ করার সুযোগ হয় নি। তিনি প্রসঙ্গ টেনে বললেন, "কিংবা আপনারা কি জাঁ পল সার্ত্র-এর মতো মনে করেন যে, যে-সাহিত্য মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণে সাহায্য করে তা কখনোই মহৎ সাহিত্য-কর্ম হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য নয়?" আমাদের একজন বলেছিলেন, "সত্যি বলতে আমরা সাহিত্যকে এভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি নি!"

তিনি খুব বিনীতভাবে বললেন, "দেখুন! অন্তত দেখতে শিখুন! তাহলে বোধহয় সভ্যতার অবসাদ-এর উৎসটা ঠিক কোন্‌খানে, হয়তো তার আভাস পাবেন!"

তারপর আপনা থেকেই জানিয়েছিলেন যে, তলস্তয়ের মতো তিনি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে নেগেটিভ মনে করেন না। এটা মানবাধিকার কর্মী হিসাবে তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতা হতে পারে। নেগেটিভ ঘটনার প্রেক্ষিতেই রাষ্ট্র কেবল শোষণের যন্ত্র হতেই পারে। সদর্থক ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে তবে কী বলা যাবে?

তাঁর মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্বগুলির কোথাও কিন্তু রাষ্ট্রকে 'নেগেটিভ' দেখার প্রস্তাবনা নেই; এমনকি যে 'মার্কসবাদী'রা রাষ্ট্রকে শোষণ-পীড়নের যন্ত্র বলতে অভ্যস্ত, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* গ্রন্থে রাষ্ট্রের যে-সারবত্তা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মর্মোদ্ধারে তাঁদের বোধহয় কোথাও বিভ্রম ঘটেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে সর্বোচ্চ নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই রাষ্ট্রের উদ্‌ভব।

তাঁর সংযোজন: একটি ভুল তত্ত্ব বা তত্ত্বের ভুল প্রয়োগের সময় শুধরে নেওয়া যায় কিন্তু তত্ত্বের ভুল অনুধাবন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটলে তত্ত্বটাই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

তিনি আরো বলেছিলেন, "দেখুন, যে-কোনো সাহিত্যের চরিত্র, যদি সে মানুষ হয়, সে পলিটিক্যাল অ্যানিম্যাল—তাকে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে বিক্রি করতে হয়, কেউ কেনে—

এরা দু'জনেই রাজনৈতিক পশু আবার অর্থশিকারী জীবও— এমনকি আমরা, এই যারা সভ্যতার অবসাদ নিয়ে ভাবছি, কথা বলছি— আমরাও রাজনৈতিক পশু, অর্থশিকারি জীব— ভাবতে যদি কষ্ট হয় তাহলে এই প্রশ্নটা করা যাক— উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ হোক এই ভাবনায় বহু কথা বলা হয়েছে সাহিত্যে ও দর্শনে— তা সাহিত্যে-দর্শনেই থেকে গেল কেন?"

৬

এ-পৃথিবীতে মানুষের বিচিত্র চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। সীমিত সম্পদ অসীম চাহিদার মধ্যে সমীকরণ করাই অর্থনীতির কাজ আর চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করবার কাজ হলো রাজনীতির। এই দুই কাজের মধ্য দিয়েই আদি সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হয়েছিল। তখন শোষক-শাসক সহায়কশ্রেণি আর জনসাধারণ-এর অনুপাত কী ছিল বলা মুশকিল। কিন্তু তখন রাষ্ট্র-কাঠামোর বিন্যাস ছিল আনুভূমিক। এটা অনুমান করা সম্ভব রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস অনুসরণ করে। এবং এও অনুমেয় যে, আজও যেমন আইনের শাসন যথাযথভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি, তখনও তেমনটাই ঘটেছিল, আর তখন থেকেই সভ্যতার বিকাশ উল্লম্ব হতে শুরু করে— এবং প্রত্যেক স্তরে একাধিক 'পিরামিড' তৈরি হতে থাকে— আধুনিক সভ্যতার যে 'পিরামিড' আমরা কল্পনা করছি তা অগণিত ছোটো ছোটো 'পিরামিড'-এর সমষ্টি— বা আধুনিক পরিভাষায় বলা ভালো: ক্ষমতা-কেন্দ্রের সমন্বয়।

তা যদি বলা হয়, তাহলে কিন্তু সমাজের পিরামিড-শেপটাকে একটু টলানো যায়, ক্ষমতার কেন্দ্র থাকলে তার সীমাবদ্ধতা থাকবে, অর্থাৎ প্রান্তিকতা— এই প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষকেই তো অধিকার দেওয়ার কথা বলে রাষ্ট্র। এই অধিকার অস্বীকার করার ফলে, তার মর্যাদাহানি করার ফলেই তো সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, দিয়েছে—

চলমান তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করবার একটা উপায় হতে পারে 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ'-কে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে চর্চা করা— রাজনৈতিক পশুত্ব থেকে তার মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটবে— এটা গভীর প্রত্যয়ে বলা।

কথা ও কাজের মধ্যে যত সমন্বয় ঘটবে ততই সভ্যতা অবসাদমুক্ত হবে।

এটা কি এক ধরনের ইউটোপিয়া হয়ে গেল না?

এই প্রশ্নটা— আমাদের আলোচনায় এক অন্য মাত্রা যোগ করল বা বলা ভালো উপলব্ধি: আসলে সংকটটা মানুষ হয়ে-ওঠার— ইউটোপিয়া একমাত্র 'মানুষ'ই ভাবতে পারে। সেই মনুষ্যত্ব এখনও আমরা অর্জন করতে পারি নি। ইউটোপিয়া অন্তর্বস্তুতে এক মানবিক অর্থনীতির ধারণা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রতারণা-বঞ্চনা-চুরির উস্কানি থাকবে না।

আসুন আপাতত সমানুভূতির চর্চা করা যাক।